ধানের দাম : মাঠ পর্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা

নাহিদ হাসান নলেজ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের জন্য তা প্রায়ই বিপদের কারণ হচ্ছে। এই মৌসুমে ধানের দাম তার উৎপাদন খরচের চাইতে কম ছিলো। উৎপাদন উপকরণের দাম, বাজারের ওপর অনুৎপাদক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতের গুদাম খালি করা চাল বাংলাদেশের বাজারে ছেড়ে দেয়ায় এবারের পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন ছিলো। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই লেখা।

'তাঁর জীবিকা কারখানা শ্রমিকের চেয়েও অনিশ্চিত, সে তবু দু-একটা দিন শান্তিতে থাকতে পায়; চিরলাঞ্ছিত ঋণদাস (কৃষক) সেটুকুও পায় না।'

কথাগুলো দেড় শ বছর আগে 'ফ্রান্স-জার্মানির কৃষক সমস্যা' পুস্তকে বলেছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (পৃষ্ঠা-১১২, রচনা সংকলন-২য় খণ্ড ২য় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭২)। গরিব কৃষকের দেশ বাংলাদেশের সাথে দেড় শ বছর আগের ফ্রান্স-জার্মানির কী অদ্ভুত মিল! শুধু ফ্রান্স-জার্মানির জায়গায় যেন বাংলাদেশ শব্দটি বসিয়ে দিলেই হয়। অন্তত অনেক কষ্ট সয়ে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে ফসল ফলানোর পরে কৃষক তার ফসলের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিলে এই বাস্তবতাটুকু টের পাওয়া যায়। সেই বাস্তবতাটুকুর কিছু খণ্ডচিত্র এই লেখাটির উপজীব্য।

ধানের কম দাম

যে কোনো ফসলের মৌসুমে এ রকম শিরোনাম—'ধানের উৎপাদনে খরচ উঠছে না, কৃষকের মুখে হাসি নেই' এখন খুবই স্বাভাবিক এবং প্রথাগত হয়ে পড়েছে। যেমন—গত ৫ মে ২০১৫ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো এই শিরোনামে লিখেছে, "কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় তিন সপ্তাহ ধরে পুরোদমে চলছে বোরো ধান কাটার উৎসব। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এ বছর ধানের ফলনও ভালো হয়েছে।

কিন্তু বাজারে দাম কম থাকায় কৃষকদের উৎপাদন খরচ উঠছে না। তাই কৃষকদের মুখে হাসি নেই। নিকলী উপজেলার সদর ইউনিয়নের বড়হাটি গ্রামের নজরুল ইসলাম বলেন, 'অখন [এখন] যে অবস্থা! গিরস্থি খরি [চাষ করে] জমি বেচি বেচি [বিক্রি করে] খাওয়া লাগবে। এখন নতুন ধান বিক্রি করছি ৪৫০ টাকা মণ। এই ধান জমিতে চাষ করতে বীজ, সেচ, সার, ডিজেল, কীটনাশক, শ্রমিক খরচসহ পড়ছে ৭০০ টাকা মণ। যদি এই দাম থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আর বোরো ক্ষেত করবাম [করব] না।'

অখন [এখন] যে অবস্থা! গিরস্থি খরি [চাষ করে] জমি বেচি বেচি [বিক্রি করে] খাওয়া লাগবে। এখন নতুন ধান বিক্রি করছি ৪৫০ টাকা মণ। এই ধান জমিতে চাষ করতে বীজ, সেচ, সার, ডিজেল, কীটনাশক, শ্রমিক খরচসহ পড়ছে ৭০০ টাকা মণ। যদি এই দাম থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আর বোরো ক্ষেত করবাম [করব] না।

একইভাবে সদর ইউনিয়নের বালিয়াহাটি গ্রামের কৃষক শুক্কুর মাহমুদ বলেন, 'আমার আট একর জমিতে আবাদের মোট খরচ হয়েছে সাড়ে চার লাখ টাকা। ধান বিক্রি করে হবে আড়াই লাখ টাকা। দুই লাখ টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। প্রতিবছর জমি চাষ করে লোকসান দিয়ে জমি বিক্রি করে সংসার চালাতে হচ্ছে। এভাবে আর কত বছর চলব? এ বছর আমি নিজের আইলে সেলাম করে আসছি, আগামী বছর থেকে আর জমিতে ধান চাষ করব না।' কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার একজন কৃষক ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল মান্নান সরকার বলেন, '২০ কাঠা জমিতে মোট খরচ পড়েছে ২০ হাজার ১০০ টাকা। ধান পেয়েছি ৩০ মণ। মণপ্রতি খরচ দাঁড়িয়েছে ৭০০ টাকা। আর ধান বিক্রি করেছি ৬০০-৬৫০ টাকায়।' একই উপজেলার পাত্রখাতা গ্রামের কৃষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ ভোলারছড়া নামক বিলে এক বিঘা (২০ কাঠা) জমিতে ধান পেয়েছেন এক মণ। তিনি বলেন, 'ভোলারছড়ায় কমপক্ষে ৩০০ বিঘা জমিতে সাদা পোকার মড়ক লেগে ধান নষ্ট হয়েছে। গড়পড়তা ধান পাওয়া গেছে এক-দুই মণ। সামনে আন্ধার দেখতেছি, বাবা।' এদিকে ধানের দাম না বাড়ার কারণ জানার জন্য কয়েকজন কৃষক, শিক্ষক ও কৃষক সংগঠকের সাথে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে থানাহাট পাইলট হাই স্কুলের শিক্ষক রহমত আলী (৪৭) বলেন, 'অতি উৎপাদন ও গুদামে পূর্ব মজুদ থাকায় ধানের দাম বাড়েনি।' রমনা সরকারবাড়ি এলাকার চাষি বাদল সরকার (৫৫) বলেন, 'ভাতের আর আগের মতো স্বাদ নাই। মানুষ আর আগের মতো ভাত খায় না, তাই ধানের দাম কম।'

রেল-নৌ, যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটির জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক জামিউল ইসলাম বিদ্যুৎ অবশ্য অন্য বিষয়গুলোকে ধানের দাম না বাড়ার কারণ হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, 'পুঁজির সংকট থাকায় কৃষকরা জমির ধান বিক্রি করতে বাধ্য হন। তারপর আছে ঝড়-বৃষ্টির ভয়, ভারতীয় চাল আমদানি ইত্যাদি'।" এ ক্ষেত্রে গত ১২ জুন ২০১৫ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর 'কৃষক এখনো ধানের দর পাচ্ছেন না' শিরোনামের প্রতিবেদনটি খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, '১০ লাখ টন চাল ও এক লাখ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খাদ্য বিভাগ গতকাল বৃহস্পতিবার [১১ জুন ২০১৫] পর্যন্ত দুই লাখ ৩২ হাজার টন চাল সংগ্রহ করতে পেরেছে। খাদ্য বিভাগের হিসাব

অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত চাল আমদানি ১৪ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন। আরো ১৬ লাখ টন চালের আমদানিপত্র খোলা হয়েছে।'

সরকারি পর্যায়ে ফসল ক্রয়ে ধোঁকাবাজি

গত ১৫.০৬.২০১৫ তারিখে চিলমারী খাদ্য কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, 'চিলমারীতে চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৪৪৫ টন ও ধানের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ টনের কিছু বেশি। এখন পর্যন্ত ধান ক্রয় শুরু হয়নি।' তার মানে হলো, ধান ক্রয় এমন সময় শুরু হবে, যখন কৃষকের হাতে বিক্রি করার মতো ধান থাকবে না। অতীতে কখনই কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা হয়নি। তবে সরকারি পর্যায়ে ধান ক্রয় শুরু হলে বাজারে ধানের দাম কিছুটা বাড়ে। আর ইতিমধ্যে কৃষকদের নিকট থেকে যে গম সংগ্রহ করা হয়েছে তার তালিকা চাইলে তিনি বলেন, 'কিভাবে এগুলো সংগ্রহ করা হয় আপনারা তো সবই জানেন। আর যে সময়ে গম সংগ্রহ করা হয়েছে, তখন কৃষকের হাতে গম থাকার কথা নয়।' গত মে মাসে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় প্রায় ৯০০ টন গম সংগৃহীত হয়। অন্য সব স্থানীয় সংসদ, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ সরকারি কর্মকর্তা, যুব ও ছাত্রনেতাদের মধ্যে গম সংগ্রহের কোটা বণ্টন করার পর কৃষকদের জন্য নির্ধারণ করা হয় মাত্র ১২০ টন। অবশ্য এটাও এমনি এমনি হয়নি। তবে এ বছর স্থানীয় গণকমিটির জোরালো তৎপরতার কারণে কৃষকদের নিকট থেকে এই পরিমাণ গম সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হয়।

কৃষিপণ্যের যথাযথ দাম না পেতে পেতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, পারিবারিক সংকটে গরিব কৃষক জমি হারিয়ে নিঃস্ব হবে–এটাই যেন এযাবৎকালের নিয়ম।

পাশের চিলমারী উপজেলায় সরকারিভাবে মোট গম সংগ্রহ করা হয় ৫৪৫ টন। পুরোটাই স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। স্থানীয় বাজারে কৃষকরা মণ প্রতি ৬৫০ টাকায় গম বিক্রি করলেও সরকারি গুদামে প্রভাবশালী মজুদদারদের দাম দেওয়া হয় ১১৫০ টাকা। সরকারি গুদামে গম বিক্রি করতে প্রয়োজন স্লিপের, যা আবার সংগ্রহ করতে হয় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে। এক টন গম বিক্রির জন্য একটি স্লিপ। প্রান্তিক কৃষক-ব্যবসায়ী আর মুজদদাররা প্রভাবশালীদের নিকট থেকে শুধুমাত্র এই স্লিপ কেনার পরই নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী গুদামে সরবরাহ করেন। চিলমারী উপজেলার মাচাবান্ধা ওয়ার্ডের ফকিরপাড়া গ্রামের চাষি শওকত আলী (৬০) বলেন, 'কায়সার, নুর মোহাম্মাদ, সাইদুরসহ অনেক কৃষকই স্লিপের অভাবে গুদামে গম বিক্রি করতে পারেননি। নেতাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে সংগ্রহ করা স্লিপ না দেখালে খাদ্যকর্তা ধান-চাল নেন না।' অর্থাৎ এই ধান-চাল সংগ্রহ ব্যাপারটি পুরোটাই ধোঁকাবাজিতে পরিণত হয়েছে, যা প্রশাসন ও দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য এক প্রকার মাসোহারার মতো।

শেষ কথা

১৯৬৯ সালে সর্বনিম্ন মুজরি নির্ধারিত হয় সাকল্যে ১৩০ টাকা। আর একজন কৃষক এক মণ (৩৭.৩২ কেজি) চাল বিক্রি করে পেতেন ৩০ টাকা। এই টাকায় কমপক্ষে তখন কেনা যেত একটি এক কেজি পরিমাণের ইলিশ (১.৫০ টাকা), একটি সুতি শাড়ি (৮ টাকা), একটি লুঙ্গি (৫ টাকা), এক কেজি সরিষার তেল (২.৫০ টাকা), এক কেজি গরুর মাংস (১.৫০ টাকা), এক কেজি মসুর ডাল (৮০ পয়সা), এক লিটার কেরোসিন তেল (৪৮ পয়সা), এক কেজি লবণ (২৫ পয়সা), একটি গামছা (১.৫০ টাকা), এক মণ জ্বালানি কাঠ (২.৫০ টাকা), এক কেজি ওজনের দেশি মুরগি (১.৭৫ টাকা), এক কেজি চিংড়ি (১ টাকা), এক ডজন ডিম (১.৫০ টাকা)। আর এখন এক মণ চালের বর্তমান বাজারমূল্য বড়জোর ১০০০ টাকা। এই টাকায় বর্তমানে ওই ১৩টি পণ্য কেনা সম্ভব কি না কিংবা ওই ৩০ টাকায় শুধুমাত্র একটি ইলিশ পাওয়া যাবে কি!

কৃষিপণ্যের যথাযথ দাম না পেতে পেতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, পারিবারিক সংকটে গরিব কৃষক জমি হারিয়ে নিঃস্ব হবে–এটাই যেন এযাবৎকালের নিয়ম। অবিভক্ত বাংলার স্পিকার, শিক্ষামন্ত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আজিজুল হক তাঁর 'বাংলার কৃষক ১৯৯২' বইটিতে অনিশ্চিত বৃষ্টি-বন্যা ঋণ, মামলা-মোকদ্দমা ঋণ, অদূরদর্শিতা ঋণ, পৈতৃক ঋণ, বন্ধকী ঋণসহ কয়েক প্রকার ঋণের কথা উল্লেখ করেছিলেন (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯ সাল, অনুবাদ ওসমান গণি, বাংলা একাডেমি)। বর্তমানে নিশ্চিতভাবে এই ঋণের তালিকা আরো লম্বা হয়েছে।

পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদন ও অর্থনীতিতে পুঁজির প্রাধান্য থাকে। এই প্রাধান্যের একটি শর্ত কৃষক ও কৃষি মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। তাদের আয়বৃদ্ধি ছাড়া শিল্পসহ সামগ্রিক উৎপাদন বা দেশীয় বাজার সৃষ্টি হয় না। আর দেশীয় বাজার সৃষ্টি না হলে শিল্পায়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শিল্পায়নের জন্য দেশীয় বাজার আর দেশীয় বাজারের জন্য চাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা ভূমিজ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য। তাহলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি কিভাবে সম্ভব? এ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকানার বদলসহ ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতি ওয়ার্ডে চাষের জন্য ট্রাক্টর স্টেশন, সেচের ডিজেল-বিদ্যুৎ-সার-বীজ-কীটনাশক কম দামে বিতরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সমবায়ের মধ্যে এনে এই সহযোগিতা করতে হবে। প্রতি উপজেলায় সবজি সংরক্ষণাগার গড়ে তুলতে হবে। সরাসরি কৃষকের হাত থেকে ফসল ক্রয় এবং কৃষকের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। সংসদে শ্রমিক-কৃষকের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে। কৃষকের মুক্তি মানে সত্য সত্যই বাংলাদেশের মুক্তি–কথাটা জাতীয়ভাবে বুঝতে হবে। এই মুক্তির পথে কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই!

নাহিদ হাসান নলেজ: প্রধান সমন্বয়ক, রেল-নৌ, যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটি,কুড়িগ্রাম।
ইমেইল: nahiduttar@yahoo.com

তথ্যসূত্র:

এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক (১৯৭২), রচনা সংকলন, ২য় খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন?
হক, আজিজুল (১৯৩৯) [১৯৯২] *[অনুবাদক: ওসমান গণি], বাংলার কৃষক*, ঢাকা: *বাংলা একাডেমি*